

নাম: মো: সরোয়ার হোসেন শাওন

জন্ম তারিখ: ৩ জানুয়ারি, ২০০৯

শহীদ হওয়ার তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : দোকানের কর্মচারী,

শাহাদাতের স্থান :রামপুরা, একরামুল্লাহা স্কুলের মেইন গেট থেকে কিছুটা সামনে

শহীদের জীবনী

বৃহত্তর বরিশালের নদী পরিবেষ্টিত থানা মেহেন্দিগঞ্জ। এই থানার উলানিয়া ইউনিয়নের প্রত্যন্ত গ্রাম পানবারিয়া। নদী বিধৌত এই থানায় ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখ পিতা-মাতার কোল আলো করে জন্মে ছিলো এক ফুট ফুটে পুত্র সন্তান। পিতা মাতা এই ফুটফুটে শিশুর নাম রেখেছিলেন সরোয়ার হোসেন শাওন। শাওনের জন্মের মাধ্যমে জাকির খান ও সেলিনা বেগম দম্পতি প্রথমবারের মতো বাবা মা হয়েছিলেন। প্রথম সন্তান শাওনের জন্মের পরেই পরিবারটি আনন্দে আবেগে আপ্ত ছিল প্রথমবারের মতো বাবা-মা হতে চাওয়ার স্বপ্নটা বাস্তবে পরিণত হওয়া কতইনা চমৎকার।

হতদরিদ্র কৃষক পরিবারের প্রথম সন্তান শাওন। শাওনের জন্মের পর থেকেই বাবা স্বপ্ন বুনছিলেন সন্তান বড় হয়ে পরিবারের দায়িত্ব নিবে, ঘুচে যাবে দারিদ্রের দাবানল। অভাবের কারণে বাবা জাকির খান তেমন পড়াশোনা করতে পারেননি। এই একই অভাবের হাতছানিতে শাওনের পড়াশোনাটাও বন্ধ হয়ে গেছিলো। বাড়ির পাশেই ছিল একটি মাদ্রাসা সেখানেই পড়ার স্বপ্ন ছিল শাওনের। পরিবারের ছোট বোনদের পড়াশোনা বাবার সহযোগিতা শাওনকে বাধ্য করে কাজ খুঁজতে। তাইতো ১৫ বছর বয়সী উড়ন্ত যুবক যে কিনা স্বপ্ন দেখবে ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/টিচার/পাইলট হওয়ার। দরিদ্র পরিবারে এসব স্বপ্ন দেখাও যেনো অবাস্তব। যেখানে পেট চালানো দায়, সেখানে আবার পড়াশোনার বিলাসিতা। এজন্যই করোনা চলাকালীন সময়ে মাত্র নবম শ্রেণীতে থাকাকালীন পিতা-মাতার অসুস্থতা ও পরিবারের হতদরিদ্রতার কারণে এত অল্প বয়সে পরিবারের হাল ধরতে ঢাকায় চাকরিতে যোগ দেয় শাওন। একটা দোকানের কর্মচারী হিসেবে চাকরিতে যোগদানের পর শাওন খুব অনুভব করতে থাকলো পড়াশোনার কোনো সার্টিফিকেট থাকলে হয়তো আরেকটু ভালো বেতনের ভালো মানের জব পাওয়া যেতো। তাইতো পড়াশোনার অদম্য ইচ্ছেটাকে দমিয়ে না রেখে চাকরির পাশাপাশি ভোকেশনাল এ ভর্তি হয়ে যায়। শাওনের বাবা গ্রামের বাড়ি বরিশালে পরিবার নিয়ে থাকেন। দৈনিক শ্রমিকের কাজ করে ও অন্যের জমিতে চাষাবাদ করে কোনরকমে টেনেটুনে সংসার চালাতো শাওনই ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।

একটা সন্তানকে জন্ম থেকে বড় করতে পিতা মাতাকে কত সীমাহীন দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়। তবুও পিতা মাতা আশায় বুক বাঁধেন। হয়তো সন্তান বড় হলে তাদের দারিদ্রতা ঘুচে যাবে। হয়তো বা সন্তান পরিবারের দায়িত্ব নিবে/বাবা মায়ের দুঃসহ পরিশ্রমের একটুখানি বিরতি ঘটবে। দারিদ্রতার দাবানলে মাকে আর মুখ লুকিয়ে কাঁদতে হবে না। এই স্বৈরাচার ভ্রমপন্থা সরকার এভাবেই হাজারো মায়ের বুক খালি করে দিয়েছে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে কেড়ে নিয়েছে। এমন কোন ঘৃণ্য কাজ নেই যা এই স্বৈরাচার সরকার করেনি।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

বাবা-মা, ছোট এক ভাই ও এক বোনকে নিয়ে গোছানো একটা পরিবার ছিল শাওনের। দরিদ্র পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি শাওনের বাবা। তিনি পেশায় দৈনিক শ্রমিক ও অন্যের জমি চাষাবাদ করে টেনেটুনে সংসার চালান। অন্যের কাছে কাজের খোঁজ খবর পাইলে কাজ করেন আর কাজ না পাইলে বেকার বসে থাকতে হয়। পরিবারের অভাবের কারনেই অতি আদরের প্রথম সন্তানকে পড়াশুনা ছাড়িয়ে কাজে পাঠিয়েছিলেন। শাওনের ১৪ বছর বয়সী ১টি বোন ও ৮ বছর বয়সী ১ টি ভাই আছে। নিজেদের ধান উৎপাদনযোগ্য কোনো জমি নেই। ৮ শতাংশ জমির উপর টিনের চালাবিশিষ্ট কাঠের ঘর।

ঘটনার প্রেক্ষাপট ও আন্দোলনের যোগদানের প্রারম্ভিকতা

ছাত্র আন্দোলন শুরু হওয়ার আগ থেকেও গোটা বাঙালি জনতার আক্রোশ ছিল স্বৈরশাসকের উপর। আর দশজন সাধারণ বাঙালির মতো শাওনেরও ক্ষোভ ছিল স্বৈরাচার সরকারের উপর। আন্দোলনের শুরু থেকেই শাওনের ও ইচ্ছে ছিল আন্দোলনে যোগ দেওয়ার। ১৮ই জুলাই ছাত্রদের ঘোষণা অনুযায়ী সারাদেশে শাটডাউন কর্মসূচি শুরু হয়। এ দিনটিতে সারাদেশে প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিক্ষোভ মিছিলে আর্মি, পুলিশ আওয়ামী হানাদার বাহিনী হামলা চালায়। এই বিশেষ দিনটিতে মুম্বসহ ৪০ জন শাহাদাতবরণ করেন। সারাদেশে বিজিবি মোতায়েন ও আর্মি হানাদারদের দিয়ে হামলা চালানোর পরেও শিক্ষার্থীদের আন্দোলন কোনভাবেই দমানো যাচ্ছিলো না। তখনো নেট ব্যবস্থা চালু ছিল। মুম্বর মৃত্যুর সংবাদ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র আন্দোলনকে বহুগুণ বেগবান করে দিয়েছিলো মুম্বসহ ১৮ই জুলাই এর শহীদদের আত্মত্যাগ। শাওন ও মোবাইল থেকে আন্দোলনের এই চুম্বক নিউজগুলো দেখতে ছিল, আর আন্দোলনে কার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। ১৮ই জুলাইয়ের শহীদদের আত্মত্যাগ শাওনকে অনুপ্রাণিত করে আন্দোলনে নামতে। যদিও শাওনের সরকারি চাকরিতে যোগ দেওয়ার মতো কোন ইচ্ছা বা পরিস্থিতি ছিল না। তবুও মনে করেছিল আমি না হয় চাকরি নাই করলাম আমার ছোট ভাইবোনেরা তো একদিন এই চাকরির ব্যবস্থা চলে আসবে ওদের জন্য না হয় কিছু করি।

আন্দোলনের যোগদানের সময়

১৯ জুলাই শুক্রবার জুমার নামাজ পড়ে বাসায় এসে দুপুরের খাবার খেয়েছিলো শহীদ শাওন। খাবার শেষ হওয়ার পরে শাওনের মা তাকে ফোন দিয়ে জানতে চেয়েছিলো শাওন বাসায় নাকি বাসার বাহিরে। ফোনে মাকে শাওন বলেছিল বাসায় ক্ষুধা বলার এক পর্যায়ে শাওনের মা ফোনে বিকট ধরনের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, মায়ের সাথে কথা বলতে বলতে শাওন বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং মিছিলে যোগদান করে। ফোনের ওপাশ থেকে চোঁচামেচির শব্দ শোনার কারণে শাওনের মা ফোন কেটে দিয়েছিলেন। ফোন কাটার ৫ মিনিট পরে শাওনের মা আবার কল দিয়েছিলেন শাওনকে। কিন্তু এরপরে

তিনি আর তার আদরের সন্তানের সাথে কথা বলতে পারেন নি। কারণ ফোন বন্ধ পেয়েছেন। শাওনের আন্দোলনের যোগদানের স্থান ছিল রামপুরার একরামুল্লাহ স্কুলের প্রধান গেট।

আহত হওয়ার সময়

একরামুল্লাহ স্কুলের প্রধান গেট থেকে মিছিল নিয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা কিছুটা সামনে অগ্রসর হলে পুলিশ বিজিবি আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। রাবার বুলেট, টিয়ারশেল সহ মরণঘাতী বুলেট কোন কিছুই যেন বাদ দেয়নি। আন্দোলনকে শিক্ষার্থীদের বুকে ঝাঁঝের করে দিয়েছিলো অত্যাচারীদের এই বুলেট গুলো। শাওনও ছিল এই মিছিলের প্রথম সারিতে, তাইতো হট্টগোলের মধ্যেই হঠাৎ করে একটা বুলেট এসে তার পেটে লেগে পিঠের দিক থেকে বের হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই শাওন হাটীর শক্তি হারিয়ে ফেলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

আহত শাওনকে উদ্ধার প্রচেষ্টা:

সময়টা আনুমানিক দুপুর ৩.৩০ হবে। পুলিশের অতর্কিত হামলায় শিক্ষার্থীরা কিছুটা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আহত শাওন লুটিয়ে পড়ে রাস্তায়। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা পুলিশের বাধাকে অতিক্রম করে আহত শাওনকে কাঁধে করে গাড়ির খোঁজ করতে থাকে। আহত শাওনকে উদ্ধার করতে যেয়ে আরো কিছু শিক্ষার্থীরা বুলেট থেকে আহত হন।

উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া:

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা অনেক কষ্টে কোনরকম একটা গাড়ি ঠিক করে শাওনকে নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা করে। হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছার আগেই বুলেটের তীব্রতায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে শাওনের শরীর নিস্তেজ হয়ে আসে। পথিমধ্যেই শাওন তার কোন রব এ ডাকে সাড়া দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শাওনের রক্তে লাল হয়ে যায় বন্ধুদের দেহ। বৈষম্যহীন দেশ করার জন্য শাওনের রক্তে লাল হয়ে যায় এদেশের মাটি।

হাসপাতালে ভর্তিতে বাঁধা:

বিপ্লবী জুলাইয়ের এই দিনগুলোতে হাসপাতালের পরিস্থিতিও ছিল খুবই ভয়াবহ। অধিকাংশ হাসপাতালে আন্দোলনকারী আহত শিক্ষার্থীদের কে ভর্তি করানোয় ছিলো নানান নিষেধাজ্ঞা। আহত শাওনকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান শাওন হাসপাতালে আসার কিছুক্ষণ পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন। শহীদের লাশ আনতে বাঁধা:

জুলাইয়ের সকল শহীদদের লাশ পরিবারে ফিরিয়ে নিতে ও দাফনের কাছে সমাপ্ত করতে দুর্বিষহ বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। শাওনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাইতো অতি গোপনীয়তার সহিত শাওনের মৃতদেহ নিজ জেলা বরিশালে নিয়ে আসতে হয়েছিলো মৃত্যুর খবর মাইকিং করার ও সুযোগ হয়নি কারণ দালাল বাহিনী প্রতিটি জেলা ও ইউনিয়নের ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো। তাইতো ছোটো পরিসরে অল্প সংখ্যক লোকের উপস্থিতিতে শাওনের নামাজের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়।

শহীদের নিকট আত্মীয়ের স্মৃতিচারণ:

বাবা আমার সন্তান শাওনের মাধ্যমেই বাবা ডাক শোনার অপেক্ষা শেষ হয়েছিলো। শাওনের জন্ম লাভের মাধ্যমে আমার পরিবার আল্লাহর বারাকাহতে ভরে গিয়েছিলো। আমার ছেলেটা খুব নামাজী, সৎ ঈমানদার ও বিনয়ী প্রকৃতির ছিলো। শিশু বয়স থেকে আগ পর্যন্ত আমাকে কখনো অসম্মান করেনি। বরং আমার ও পরিবারের আর্থিক অনটন সবসময়ই বুঝতো আমার বাজান। ছোট ভাই বোনের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছিলো। এত ছোট বয়সে আমার বাজানের কথা ছিল আমি পড়াশোনা শেষ করতে পারিনি তো কি হয়েছে আমার ভাই-বোনেরা পড়াশোনা করে জীবনে বড় কিছু হবে। ছোটবেলা থেকে আমার সাথে মসজিদে নামাজ পড়তে যেত। কি করে ভুলবো সন্তান হারানোর এই ব্যথা। সব থেকে ভারী পিতার কাছে সন্তানের লাশ। সে ভারী জিনিসটাকে কবে রেখে আসতে হয়েছে কিছুই করার ছিল না পরিবারের দারিদ্রতা ঘোচাতে কাজে যোগদানের পরেও শাওন বাবা-মা ও ভাই বোনদের খোঁজ নিতে কখনো ভুলে যায়নি প্রতি পদে পদে সন্তানের স্মৃতি হাঁতড়ে বেড়ায় আমাকে।

মা: প্রথম সন্তান তো হয় বুকের আদরের মানিক। সে মানিককে হারিয়ে মা পাগল প্রায়। চোখের পানি শুকিয়ে গেছে তবু কান্না থামছে না। কে থামায় মায়েরে আহাজারি এ আর্তনাদ। যেমনো আকাশ বাতাস ভারী হয়ে যাচ্ছে। কথায় কথায় শাওনের মা বলছিলেন কে সারা দিনে ৮-১০ বার ফোন করে আমার খোঁজ নিবে, কে খোঁজ নিতে ছোট ভাই বোনদের। ছোট ছেলেটা যখন ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করে কোন উত্তর দিতে পারি না শুধু আচরে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে থাকি। আল্লাহর কাছে শুধু একটাই প্রার্থনা আমার মত আর কোন মায়ের বুক যেন এভাবে খালি হয়ে না যায়। সকল সন্তানেরাই তাদের মায়ের মায়ের বুক আগলে থাকুক এই দোয়াই করি সবসময়।

ছোটবোন: আধো আধো মুখে যখন কথা বলতে পারি তখন বাই বাই বলে কত ডেকেছি। ভাইয়াও অধীর আগ্রহে থাকত ডাক শোনার জন্য। বয়সে চার বছরের বড় হলেও ভাইয়ার সাথে ছিল আমার বন্ধুর মত সম্পর্ক। সবকিছুই আমরা একে অপরের সাথে শেয়ার করতাম। ভাইয়া প্রতিদিন ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করত পড়াশোনার জন্য আমার কি কি লাগবে। ভাইয়াকে হারানোর আড়াই মাস পার হলেও পড়াশোনায় মন বসাতে পারছি না।

ছোটভাই: আমার ভাই খুব ভালো ছিলো। আমাকে খুব আদর করত, খুব ভালোবাসতো।

বাস বাড়িতে আসলে আমার জন্য মজার মজার খাবার নিয়ে আসতো। ফোন দিলেই আমার কাছে জানতে চাইত আমার কি লাগবে। এখনো মনে হয় ভাইয়া ফিরে আসবে আদর মাখা কণ্ঠে আমাকে ডাকবে।

মামা: শাওন খুব মেধাবী একটা ছেলে ছিল। ষড়্দের সবাইকে সম্মান করত আর ছোটদের কে স্নেহ ভালোবাসা আগলে রাখতো। কখনো কোন খারাপ বৈশিষ্ট্য শাওনের মধ্যে দেখিনি। আহ আহ আমার ভাগিটাকে ওরা বাঁচতে দিল না।

কাকা: আমার ভতিজা খুবই দায়িত্ববান একটা ছেলে ছিল। তাইতো এত অল্প বয়সে পরিবারের হাল ধরতে গিয়েছিলো। আমাদের কারোরই জানা ছিল না পরিবারের হাল ধরতে যাওয়া। এই ছোট যুবক ছেলেটি এত অল্প বয়সে আল্লাহ ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাবে। এই মৃত্যুকে মেনে নেওয়া আমাদের জন্য খুবই কঠিন। আল্লাহর কাছে আমরা বিচার দিয়ে রাখলাম।

ফুফু: আমার ভতিজা অসাধারণ একটা ছেলে ছিল। আদার মাখা কণ্ঠে ফুপু ফুপু করে ডাকতো। বেড়াতে আসলে টেনে ধরে থাকতো, যেতে দিতে চাইতো না। সন্তান সমতুল্য শাওনকে হারিয়ে আমরা সবাই মর্মান্বিত।

সহপাঠী: আমাদের বন্ধু শাওন খুব মিশুক একটা ছেলে ছিলো। আমাদেরকে নামাজের জন্য ডাকতো। একসাথে খেলতাম। কখনো কারো সাথে কথা কাটাকাটিও হতে দেখিনি। খুব শান্ত মেজাজের একটা ছেলে ছিল। আমাদেরকে ভালো পরামর্শ দিত। দেখা হলেই বলতো কিভাবে পরিবারের জন্য ভালো কিছু করা যায় এই নিয়ে চিন্তা করছি। শাওনের মত একটা বন্ধুকে হারিয়ে আমরা গভীর শোকাহত।

শিক্ষক: শাওন খুবই মেধাবী একটা ছেলে ছিলো। শিক্ষকদের খুব সম্মান করতো। তাহলে এভাবে চলে যাওয়াটা মেনে নিতে আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। শিক্ষার্থী

হারায়নি যারা নিজ সন্তানকে হারিয়েছি।

সহযোগিতা সংক্রান্ত একাধিক প্রস্তাবনা:

১ একটি পাকা ঘর প্রয়োজন।

২ বাবা-মার চিকিৎসার খরচ প্রয়োজন।

৩ ছোট ভাই-বোনদের লেখা-পড়ার খরচ যোগাতে সহযোগিতা করা যেতে পারে।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

পুরো নাম : মো: সরোয়ার হোসেন শাওন

জন্মতারিখ : ০৩/০১/২০০৯

পেশা : দোকানের কর্মচারী

ঠিকানা : গ্রাম: পানবাড়ীয়া, ইউনিয়ন: উলানিয়া, থানা: মেহেন্দিগঞ্জ, জেলা: বরিশাল

পিতার নাম : মো: জাকির খান, বয়সঃ ৪২, পেশা: কৃষক

মাতার নাম : সেলিনা বেগম, বয়সঃ ৩৮, পেশাঃ গৃহিণী

পরিবারের সদস্য সংখ্যা : ৪ জন

ভাই বোনের সংখ্যা : ২ জন

: ১ আফরিন আক্তার বন্যা, বয়স: ১৪ বছর, শ্রেণি: নবম

: ২ হানিফ খান, বয়স: ৮, শ্রেণি: দ্বিতীয় জামায়াত

ঘটনাস্থল : রামপুরা, একরামুল্লাহা স্কুলের মেইন গেট থেকে কিছুটা সামনে

আক্রমণকারী : আওয়ামী পুলিশলীগ

আহত হওয়ার তারিখ : ১৯/০৭/২০২৪, বিকাল ৩:৩০ টা

মৃত্যুর সময় ও তারিখ : ১৯/০৭/২০২৪, বিকাল ৪:০০ টা

শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান : নিজ গ্রামের পারবারিক কবরস্থানে (পানবাড়ীয়া, মেহেন্দিগঞ্জ)